যুক্তরাষ্ট্র ট্রেড শো-তে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত জানিয়েছেন রাষ্ট্রদুত মেরি অ্যান পিটার্স

ঢাকা, ২৯শে জানুয়ারী -- যুক্তরাষ্ট্র ট্রেড শো উপলক্ষ্যে গত ২৮শে জানুয়ারী আয়োজিত স্বাগত নৈশ ভোজে আমেরিকান রাষ্ট্রদুত মেরি অ্যান পিটার্স যে ভাষণ প্রদাণ করেছেন তার পূর্ণ বিবরণ:

জনাব আফতাব, আপনার সহৃদয় সূচনা বক্তব্যের জন্য ধন্যবাদ। আপনাকেও ধন্যবাদ জনাব নাজিম হক আপনার মন্তব্য এবং এই নৈশ ভোজ আয়োজনে বদান্যতা প্রদর্শনের জন্য।

আমেরিকান ব্যবসায় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ এবং অন্যান্য বন্ধুরা, দ্বাদশ যুক্তরাষ্ট্র ট্রেড শো-তে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। বাংলাদেশে আসার পর এটা আমার তৃতীয় ট্রেড শো যাতে আমি অংশগ্রহণ করছি এবং এর সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরে আমি খুশী।

প্রতি বছর ট্রেড শো-র আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আরো উন্নত হচ্ছে আর দুতাবাসের সঙ্গে অ্যামচ্যামের সম্পর্কও হচ্ছে ঘনিষ্ঠতর। এর আগে আমি যেমনটি কয়েকবার বলেছি যে অ্যামচ্যাম এবং দুতাবাসের সাথে জোরালো সম্পর্ক বাংলাদেশে আমেরিকান ব্যবসা বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সেপ্টেম্বর মাসে আমি খুশী হয়েছিলাম যে চট্টগ্রামে দুতাবাসের আমেরিকা সপ্তাহ উদযাপনের লক্ষ্যে আমাদেরকে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে অ্যামচ্যাম তাদের মাসিক মধ্যাহ্ন ভোজ চট্টগ্রামে স্থানান্তর করে। অ্যামচ্যাম ছাড়া আমাদের আমেরিকা সপ্তাহ সম্পূর্ণ সফল হত না।

চট্টগ্রামে অ্যামচ্যামের মধ্যাহ্ন ভোজে আমি বাংলাদেশে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে অনেক পুরস্কার এবং কিছু চ্যালেঞ্জের বিষয় উলেখ করেছিলাম। আমি উলেখ করেছিলাম যে একটি অতি পুরাতন অবকাঠামো দুর্নীতি এবং চুক্তির ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার অভাব বাংলাদেশে বিদেশী বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

আপনাদের অনেকেরই হয়ত স্মরণ থাকতে পারে যে আমার বক্তৃতার ওপর ভিত্তি করে সংবাদপত্রে বেশ কিছু নিবন্ধ এবং সম্পাদকের কাছে লেখা চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল। যদিও কিছু সংখ্যক নিবন্ধে আমার

মন্তব্যের সমালোচনা করা হয়, তবুও আমি এই ভেবে খুশী হয়েছিলাম যে জনগণ দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করছেন এবং বিতর্কে লিপ্ত হচ্ছেন।

সাম্প্রতিক একটি বিতর্কের ব্যাপারেও আমি উৎসাহিত যেটা গোটা বাংলাদেশেই হচ্ছে। এই বিষয়টি দেশের অর্থনৈতিক ভবিষ্যতকে প্রভাবিত করতে পারে। বাংলাদেশের ভাবমূর্তি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের কথাই আমি বলছি।

বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে একটি পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পীড়িত একটি দরিদ্র দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিদেশে পরিচিত। প্রকৃত বাংলাদেশ হচ্ছে ১৩ কোটি মানুষের একটি গণতান্ত্রিক দেশ যেখানে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠছে, অর্থনীতি বিকাশমান, একটি সক্রিয় সুশীল সমাজ বিরাজমান এবং দেশটি কিছু সংখ্যক সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পে সাফল্য অর্জন করেছে। অবশ্যি যেটা আমাকে অবাক করেছে তা হল বাংলাদেশীরা নিজেরাই সমাজের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোকে উপেক্ষা করে দেশটির দারিদ্র্য এবং ছোট আয়তনের প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করে থাকে।

ভাবমূর্তি নিয়ে উদ্বেগ কোন আধুনিক ধারণা নয়। এর গুরুত্ব চিহ্নিত হয় খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীতে যখন রোমান গ্রন্থকার পুবলিয়াস সাইরাস বলেন, "একটি উত্তম ভাবমূর্তি টাকার চেয়ে অধিক মূল্যবান।" সাইরাস যদি সঠিক হয়ে থাকেন, তাহলে এই অমূল্য সম্পদ নিয়ে বাংলাদেশের উদ্বেগ যথার্থই সঠিক।

এখন ভাবমূর্তির মানে হচ্ছে নিজেকে সুন্দর করে জাহির করার কৌশলের চেয়ে কিছু বেশী কাজ -- এর অর্থ হচ্ছে জনস্বার্থে দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ। তবে এজন্য প্রয়োজন একটি যথার্থ নীতি তবে ধ্যান ধারণা পাল্টে দেয়ার লক্ষ্যে এটা সবসময়ই যথেষ্ট নয় আর এজন্যই এব্যাপারে কৌশলগতভাবে চিন্তা করতে হয়। আমি একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের সামনে কথা বলছি। তাই আমার আলোচনা কেন্দ্রীভূত রাখতে চাই ভাবমূর্তি বিষয়ে, যা ব্যবসা করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ যথার্থ স্থান কি না, সে বিষয়ে ধারণাকে প্রভাবিত করবে। কয়েক বছর পূর্বে "দ্য ইকনোমিস্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধে আমাদেরকে বলা হয় যে, "একটি ক্ষতিগ্রস্ত ভাবমূর্তিকে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে মুখ্য নিয়ম হচ্ছে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পুরো সত্যটা তুলে ধরা।" এই নিয়মগুলোর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে প্রয়োগকৃত তিনটি দৃষ্টান্ত বাংলাদেশের জন্য শিক্ষণীয় হতে পারে।

আমেরিকার বিশাল ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানী জনসন অ্যান্ড জনসন "ইকোনমিস্ট" পত্রিকার এই মুখ্য নীতি অনুসরণ করে, কেউ কেউ বলে তারাই এটা সৃষ্টি করেছে। ১৯৮২ সালে কোম্পানীটি এই তথ্য উদঘাটন করে যে হত্যার আবেগে তাড়িত একজন বিকৃত ব্যক্তি বিশ্বের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যথার ওষুধ টাইলিনলের কয়েকটি বোতলে বিষাক্ত সায়ানাইড মিশিয়ে দিয়েছিল।

আপনারা হয়ত স্মরণ করতে পারেন এই তথ্য উদঘাটনের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে সাত জনের মৃত্যু হয় এবং পরবর্তীতে সংবাদ মাধ্যমের প্রচারণার কারণে দেশব্যাপী প্রচন্ড ভীতির সঞ্চার হয়। অনেক বিশেষজ্ঞ সে সময় মনে করেছিলেন যে, জনসন অ্যান্ড জনসন এবং টাইলিনল ধ্বংস হয়ে গেছে। সেটাতো হয়ইনি, বরং কোম্পানিটি এই সংকট যেভাবে মোকাবিলা করে সেটাকে ভাবমূর্তি সংক্রান্ত দুঃসহ পরিস্থিতি উতরে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাঠ্য বইয়ের একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গণ্য করা হয়।

মৃত্যুর সংবাদ পাওয়ার পরপরই জনসন অ্যান্ড জনসন কাজে লেগে পড়ে। ক্রেতাদের নিরাপত্তাকে এক নম্বর অগ্রাধিকার প্রদান করে কোম্পানীটি সংবাদ মাধ্যমের কাছে যায় এবং ভোক্তাদের টাইলিনল ব্যবহার করতে নিষেধ করে এবং ইতিমধ্যে ক্রয় করা সব টাইলিনল ফেরত দেয়ার আহ্বান জানায়। মৃত্যুর সাথে কোম্পানীর কোন সম্পর্ক নেই এই সহজ উত্তর দেয়ার বদলে জনসন অ্যান্ড জনসন সংকটের পুরো দায়দায়িত্ব স্বীকার করে এবং এই সংকট নিরসনের লক্ষ্যে কাজ শুরু করে।

জনসন অ্যান্ড জনসন এখানেই থেমে থাকেনি। কোম্পানীটির পরবর্তী কাজ ছিল তার পূর্ব খ্যাতিকে ফিরিয়ে আনা এবং টাইলিনলের ৪০ শতাংশ বাজার পুনরুদ্ধার করা। টাইলিনল সম্পর্কে ভয়ভীতি শুরু হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জনসন অ্যান্ড জনসন একটি নতুন ট্যামপারপ্রুফ বোতলে টাইলিনল বাজারে ছাড়ে। এই নতুন বোতলে ভোক্তাদের জন্য বিপুল অঙ্কের টাকা রেয়াত দেয়া হয়। এই সাথে কোম্পানী দেশব্যাপী একটি নতুন প্রচারণা ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচী শুরু করে।

এখানেই রয়েছে বাংলাদেশের জন্য মূল্যবান পরামর্শ। সংবাদপত্রে একটি রিপোর্টের মাধ্যমে যা শুরু হয়, সেটা পরিণত হয় ব্যাপক ইতিবাচক সংবাদ প্রতিবেদনে। এর মাধ্যমে জনসন অ্যান্ড জনসন তার বাজার এবং তার সুনাম পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়।

বিদেশে অবস্থিত নিজস্ব কয়েকটি জুতা কারখানায় শ্রমিকদের সুযোগ-সুবিধা সন্তোষজনক না থাকার অভিযোগে যখন নাইকি কোম্পানীর সুনাম নষ্ট হয়ে পড়ে তখন হারানো সুনাম ফিরে পাবার জন্য কোম্পানীটি একটি চমৎকার পন্থা অবলম্বন করে। নাইকি ইন্টারনেটের আশ্রয় নেয়।

সংযোজন পদ্ধতি সম্পর্কে ক্রেতাদের অবহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠানটি তার অনেকগুলো ওয়েব সাইটকে নির্দেশ দেয়। নাইকির ওয়েবপেজ কেউ পরিদর্শন করলে নাইকির সাথে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলো, কোম্পানীটির দায়-দায়িত্ব সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং বিদেশের কারখানাগুলোয় কর্মরত শ্রমিকদের জীবনের মান উন্নয়নে কোম্পানীর লক্ষ্য, ইত্যাদি বিষয় জানতে পারবে।

মজার ব্যাপার হলো এই যে, কারখানার ভেতরকার পরিস্থিতি সম্পর্কে স্বতন্ত্র অডিটর এবং পন্ডিতদের দ্বারা তৈরি রিপোর্টও ওয়েবসাইটে পরিবেশন করা হয়েছে। ইচ্ছে করলে যে কেউ এমন রিপোর্ট ওয়েবসাইট থেকে প্রিন্ট নিতে পারেন।

নাইকির একজন কর্মকর্তা তাদের এই ইন্টারনেট স্বচ্ছতাকে এভাবে বর্ণনা করেন: "ক্রীড়া সামগ্রী প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে আমরা অনুভব করি যে জোরদার অফেন্সই হচ্ছে উৎকৃষ্ট ডিফেন্স অর্থাৎ জোরদার তৎপরতাই হচ্ছে উত্তম প্রতিরক্ষা।" এই সব প্রতিকূল অবস্থা সরাসরি এবং স্বচ্ছতার সাথে মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নেয়ায় নাইকি আবার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয় এবং একটি শীর্ষ কোম্পানীতে পরিণত হয়।

বিশ্বজনীন ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে নিউ ইয়র্ক শহরের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তা বাংলাদেশের জন্য আরো উত্তম উদাহরণ হতে পারে। সত্তুরের দশকে নিউ ইয়র্ক শহর একটার পর একটা দুর্যোগের কবলে পড়ে। ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে এর গুরুত্ব নষ্ট হয় এবং শহরটিতে পর্যটকেরও সংখ্যাও কমে যায়। ১৯৭৫ সনে মুদ্রাস্ফীতি এবং মন্দার কারণে যখন আমেরিকার অর্থনীতি মন্থর হয়ে পড়ে তখন নিউ ইয়র্ক শহরটি প্রায় দেউলিয়া হতে বসেছিল। ব্যাপক দুর্নীতি দেখা দেয়, অপরাধের হার বিপুল হারে বেড়ে যায় এবং সান অফ স্যাম নামে পরিচিত এক কুখ্যাত খুনীর কবলে পড়ে এই শহর। একটার পর একটা মানুষ খুন করা ছিল তার নেশা। কিন্তু এর চেয়েও জঘন্য ঘটনা ঘটে ১৯৭৭ সালে। জুলাই মাসের এক অতি গরমের রাতে বড় রকমের বিদ্যুৎ বিপর্যয় ঘটে শহরে। আর এই সুযোগে চলে ব্যাপক লুটপাট, অগ্নি সংযোগ এবং আরো নানা সহিংস অপরাধের ঘটনা।

যুক্তরাষ্ট্রকে যারা ভালভাবে জানেন তারা বলবেন, নিউ ইয়র্কের বাসিন্দারা ধ্বংসস্তুপের মধ্য থেকে আবার নতুন করে জেগে ওঠার মত মনোবলে দৃপ্ত। তারা নিজেদের দোষত্রুটি খোঁজার পরিবর্তে তাদের শহরের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনার জন্য বেশ বলিষ্ঠ সব পদক্ষেপ নেয়।

সরকার পৌর সহায়তা কর্পোরেশন গঠন করে শহরবাসীর অর্থনৈতিক দুরাবস্থা দুর করার পদক্ষেপ নেয়। এই কর্পোরেশন শহরবাসীকে ঋণ এবং দীর্ঘ মেয়াদী বন্ড দেয়া শুরু করে। সে সময়ে একটি বড় ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও নেয় এই শহর যা অতিরিক্ত সরকারী ব্যয় কমায় এবং আমলাদের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে।

এরপর শহরটি অপরাধের ঘটনা মোকাবিলা করে। ডেমোক্র্যাট দলীয় সিটি মেয়র ডেভিড ডিনকিনস পুলিশের সংখ্যা ৪০ শতাংশ বাড়িয়ে দেন এবং ব্যাপকভিত্তিক একটি কম্যুনিটি পুলিশ বা সামাজিক পুলিশ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এই ব্যবস্থার আওতায় পুলিশ অফিসাররা নাগরিক সমাজের

লোকদের সাথে শহরতলী এলাকা পর্যন্ত একযোগে কাজ করতে থাকে। তার উত্তরসুরী রিপাবলিকান দলীয় মেয়র রুডলফ জুলিয়ানি এই সব কর্মসূচী অব্যাহত রাখেন এবং একটি "জিরো টলারেন্স" রীতি অর্থাৎ সামান্যতম অপরাধও মেনে নেয়া হবে না -- এই নীতি গ্রহণ করেন।

পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য নিউইয়র্ক বিখ্যাত "আই লাভ নিউ ইয়র্ক" আন্দোলন শুরু করে। গত বছর এই আন্দোলনের ২৫ বছর পূর্তি হলো। এই কর্মসূচীর আওতায় শহরতলী এলাকাও পরিচ্ছন্ন করা হয়। যে সব কর্পোরেশন, বাসিন্দা এবং ট্যুরিস্ট নিউ ইয়র্ক ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন বা এর প্রতি বিমুখ হয়েছিলেন তারা দলে দলে নিউইয়র্কে ফেরা শুরু করেন। ফলে হলো কি, রাজস্ব থেকে এই শহরের আয় বৃদ্ধি পায় এবং অনেক নতুন কর্মসংস্থানেরও সুযোগ হয়।

জনমনে ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারে নিউ ইয়র্কের অভিজ্ঞতা থেকে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। একটি আশু উপলব্ধি হলো পুর্বসূরীদের কাজ বানচাল না করে বরং নিউ ইয়র্কের মেয়ররা যেসব সাফল্য উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছেন, সেগুলোর ওপর ভিত্তি করে তারা কাজ করে গেছেন। একটি তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনে একজন রিপারলিকান মেয়র যখন একজন ডেমোক্র্যাট মেয়রের স্থলাভিষিক্ত হন তখনও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে। নিউ ইয়র্কের উদ্যোগসমূহের সাফল্যের জন্য দরকার সমঝোতা প্রতিষ্ঠা, দলীয় ভেদরেখার উর্ধে উঠে জোট গঠন এবং উদ্যোগসমূহ ত্রুটিমুক্ত করার জন্য অব্যাহত প্রয়াস।

আমি যেসব দৃষ্টান্ত তুলে ধরলাম, সেগুলো থেকে আরেকটি সিদ্ধান্ত টানা যেতে পারে যে জনমনে একজনের ভাবমূর্তি উন্নত করার জন্য দরকার একটি কর্মকৌশল, যা জোরালোভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়কে একটি নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করতে হবে কেননা আপনারা দেশপ্রেমিক, এটা ব্যবসার জন্যও ভালো। ভাবমূর্তির প্রশ্নে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে।

প্রথমত, একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উন্নয়নে বিরাট অবদান রাখবে। কারণ, দুর্নীতি বা সুশাসন এখানে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। বিশেষভাবে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সংগে সংশিষ্ট আরেকটি বিষয় হলো ফরেন করাপ্ট প্র্যাকটিসেস অ্যাক্টের মতো বিধি প্রণয়ন। এই বিধি ব্যবসা সংগ্রহ বা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিদেশী কর্মকর্তাদের ঘুষ দেয়া বা সুবিধা প্রদান করা আমেরিকান কোম্পানিগুলোর জন্য নিষিদ্ধ করেছে। এই বিধিতে শাস্তির ব্যবস্থা এতোই কঠোর যে আমেরিকান কোম্পানিগুলো অসাধুতার লেশমাত্র আছে এমন কাজ পরিহার করে থাকে। এর ফলে আমেরিকান কোম্পানিগুলো বিদেশী সরকারগুলোর সংগে ব্যবসা করার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও ভারসাম্য বজায় রাখে।

পূর্বতন সরকারগুলোর সম্পাদিত চুক্তিগুলোর স্বচ্ছতা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেয়া হলে সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি উন্নত হবে। একবার একটি চুক্তি সম্পাদিত হলে উভয় পক্ষই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে বাধ্য। ধরুন ছয়মাসে একটি পর্যালোচনা শেষ করার সময়সীমা কঠোরভাবে মেনে চললে বিনিয়োগকারীরা আশ্বস্ত হবে যে বাংলাদেশ চুক্তির পবিত্রতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

বাংলাদেশী পণ্য ও সার্ভিসের সর্বোত্তম মানের ওপর গুরুত্বারোপও দেশের সুনাম উন্নত করবে। কয়েক সপ্তাহ আগে আমার এক বাংলাদেশী বন্ধু আমাকে বললেন যে নিউ ইয়র্কের এক বুটিকে একটি চমৎকার জ্যাকেট দেখে আবিষ্কার করলেন যে সেটি তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে তৈরি পণ্যের উচ্চ মান দেখে অবাক হতে হবে কেন? আমার প্রশ্ন হলো যে বাংলাদেশ থেকে সহায়ক সার্ভিস ও মান সম্মত পণ্য ব্যতিক্রম নয়, স্বাভাবিক ব্যাপার হওয়া উচিত। এর চেয়ে ন্যূন কোন কিছু বাংলাদেশের মেনে নেয়া উচিত নয়।

সর্বশেষ, সরকারের বিভিন্ন বিনিয়োগমুখী নীতিগুলো বাস্তবায়নে সক্রিয় পদক্ষেপ বিনিয়োগকারীদের কাছে দেশের ভাবমূর্তি উন্নত করবে। একটি আমেরিকান কোম্পানি যে বছরে ৭০ কোটি ডলারের বাংলাদেশী পণ্য ক্রয় করে থাকে, তাকে বাংলাদেশে একটি অফিস খোলার জন্য দুতাবাসের সহায়তার প্রয়োজন হবার কথা নয়। আমি মনে করি যে একটি সফল বিনিয়োগের কাহিনী বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রাখবে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ব্যাপারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ইস্যুর উলেখ ছাড়া বাংলাদেশের ভাবমূর্তির দীর্ঘমেয়াদী দিকগুলো আলোচনা করা যায় না। আমি জানি যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির ব্যাপারে সাম্প্রতিক কিছু উদ্বেগ এই বিষয়ে কিছু অসমর্থিত সংবাদ প্রতিবেদনের সংগে সংশিষ্ট। গত সপ্তাহে আপনাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সংগে বৈঠকে পররাষ্ট্র সচিব পাওয়েল যেমন বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের অব্যাহত জোরালো অঙ্গীকার স্বীকার করে। আমরা বাংলাদেশকে একটি মধ্যপন্থী মুসলিম দেশ হিসেবে শ্রদ্ধা করি যে দেশ তার নেতৃবৃন্দ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত করে থাকে।

আমি বিশ্বাস করি না যে নতুন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতির দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি কোনভাবে প্রভাবিত হবে। এই পদ্ধতির আওতায় আসবে প্রধানত ছাত্ররা, দীর্ঘকালীন মিশনে যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণকারী কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী, আত্মীয়-স্বজনদের সংগে দীর্ঘ দিন ধরে থাকার জন্য যুক্তরাষ্ট্র গমনকারী এবং অস্থায়ী দক্ষ কর্মীরা। যেসব আমেরিকান ব্যবসায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশকে একটি বিনিয়োগ ক্ষেত্র

হিসেবে বিবেচনা করছেন, তারা সিদ্ধান্ত নেবেন বাংলাদেশে ইতিমধ্যেই যেসব বিনিয়োগকারী কাজ করছে, তাদের প্রতি বাংলাদেশ কিভাবে আচরণ করছে, তার ভিত্তিতে, যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন বিধির ওপর ভিত্তি করে নয়।

পুবলিয়াস সাইরাস সঠিক ছিলেন এটা আমাদের ধরে নেয়া উচিত। আমাদের সকলেই জনমনে আমাদের ভাবমূর্তি নিয়ে চিন্তিত হওয়া উচিত। কিন্তু আরেকজন লেখক, হেনরি ওয়াডসওয়ার্থ লংফেলোও সঠিক কথা বলেছিলেন যখন তিনি লেখেন যে "কথার চেয়ে কাজ বড়। বাগাড়ম্বর থেকে কাজ বড়।" পরিশেষে ভাবমূর্তি নির্ভর করে বাস্তব প্রমাণের ওপর, ভঙ্গী বা সঠিক বিপণন প্রক্রিয়ার ওপর নয়। যখন প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত লাইসেন্স পাবে, সততার ভিত্তিতে টেন্ডার পাবে, সাফল্যের সংগে নতুন নতুন শাখা খুলতে পারবে এবং আস্থাশীল হবে যে তাদের সংগে সম্পাদিত চুক্তিগুলোর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা হবে, তখন আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশ বিনিয়োগের জন্য একটি মুখ্য গন্তব্যস্থল হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাবে। এমন একটি ভাবমূর্তি যথার্থই কাম্য।

আমি আশা করি যে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি এবং এর সম্ভাবনার মধ্যকার ব্যবধান দুরীকরণে আপনাদেরকে আপনাদের ভূমিকা পালনে আমি অনুপ্রাণিত করতে পেরেছি। আপনাদের ধন্যবাদ।

==========

wRAvi/ 2003

`óe¨: GB wbe‡Üi Bs‡iwR fvl¨ ÔA¨v‡gwiKvb †m›Uvi Ô-G cvIqv hv‡e| hw` Avcwb Bs‡iwR fvl¨wU †c‡Z AvMnx nb, Z‡e ÔA¨v‡gwiKvb †m›Uvi Ô-Gi †cm †mKk‡b (†Uwj‡dvb: 8813440-4, d¨v·: 9881677; B-‡gBj: dhaka@pd.state.gov *Ges Website: http://*www.usembassy-dhaka.org*) †hvMv‡hvM Ki"b|*